কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার

বই আর ছবি। এই যুগলবন্দী যদি ছবির বই-এ পরিবর্তিত হয় তবে তো তার স্বাদ আলাদা হবেই। তেমনই একটি বইয়ের খবর কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত-র কলমে।

ইদানীং দেখছি আমার বই পড়ার চেয়ে বই দেখতে বেশি ভালো লাগছে। বই মানে ছবির বই। নয়তো অক্ষরমালার দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ আর থাকা যায়। বইয়ের দোকান, কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া, বইমেলা প্রায় সর্বত্রই আমি এমন ধরণের বইয়ের সন্ধানে থাকি, যে বই হাতে নিয়ে একটু চোখ মেলে দেখা যায়। এমনকি ছোটো বাচ্চাদের ছবির বই হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। শিল্পীরা কত সুন্দর সব ছবি এঁকে রাখেন বইয়ের পাতায়। কত রকমের রেখাচিত্র, কত সব সজল তুলিতে আঁকা মনকেমন করা ছবি। মনে হয় সব কাজ ভুলে বইয়ের পাতা ওল্টাই আর ছবি দেখি। পড়াশোনা যেটুকু তা হল ছবির ধরতাইটুকু পাবার জন্য। ছবির প্রসঙ্গকথা জানতে গেলে ওইটুকু তো পড়তেই হবে। তাতে আমার আপত্তি নেই কোনো। এইরকমই একটি বই পেলাম এবার কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে। প্রত্যেকবারই বাংলাদেশের বইপত্তরের টানে আমি ঢুকি সেখানে। এবারে দেখলাম টেরাকোটা মন্দিরের আদলে গড়া হয়েছে মণ্ডপ। ভারি ভালো লাগল। বইয়ের মন্দির, যেখানে ঢুকলেই মন ভালো হয়। যদিও হাল-আমলে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আর আগের মতো ভালো বইয়ের সন্ধান পাই না, তবু শিকারী-চোখে সহসা ধরা পড়ে যায় এক-একটি বই। এবারে যেমন বেঙ্গল পাবলিকেশনস্-এর স্টলে পেয়ে গেলাম শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা পোস্টারচিত্র নিয়ে ছোট্ট সুন্দর একটা বই। সদ্য প্রয়াত কাইয়ুম চৌধুরী বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় চিত্রশিল্পী। বইয়ের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, পোস্টার জাতীয় গ্রাফিক্স-এর কাজে তাঁর দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা প্রশ্নহীন। আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে তাঁর কাজ। সেই ভালোলাগার বোধ থেকেই একদা তাঁর জীবনবৃত্তান্তের খোঁজ নিয়েছিলাম। ১৯৩৪-এর জাতক কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পকলার তালিম গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকায়। ১৯৫৪-এ সেখান থেকে পাশ করে বেরোনোর কয়েক বছর পর তিনি সেখানেই দীর্ঘদিন গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শিল্পী হিসেবে

যেমন অসাধারণ ছিলেন কাইয়ুম, তেমনিই ছিলেন শিক্ষক রূপেও। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনে তাঁর অবদান দ্বিমুখী। একদিকে তিনি অজস্রধারায় কাজ করে সৃষ্টি করেছেন একটি স্বতন্ত্র ঘরানা। অন্যদিকে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীকে প্রাণিত করেছেন। মনে পড়ে, ২০১৪-তে কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুর পর *কালি ও কলম* পত্রিকা থেকে তাঁকে নিয়ে যে বিশেষ স্মরণ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটিতে শিল্পীর নানাদিক সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছিল। কাইয়ুমের কাজের বিশেষত্বগুলি হল – অসম্ভব পরিচ্ছন্নতা আর তার সঙ্গে সরাসরি বিষয়কে উপস্থাপিত করার ক্ষমতা। যে কারণে তাঁর যে কোনো কাজই খুব সহজবোধ্য। আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কাজে। বাংলাদেশের মাটির ঘ্রাণকে তিনি শিল্পের আন্তর্জাতিক ভাষা দান করেছিলেন। যে কারণে তাঁর কাজ দেখলেই বোঝা যায় শিল্পী কোথাকার মানুষ। আসলে শেকড়কে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। এই যে পোস্টারচিত্রের ওপর বইটি, সেটিতেও শিল্পীর শেকড়কে পরিষ্কার অনুভব করা যায়। বাংলাদেশের লোকজ মোটিফ-কে কতবার কতভাবে যে ব্যবহার করেছেন তিনি।

মোট চব্বিশটি পোস্টারকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এই বইয়ের লেখক শর্ব্বরী রায় চৌধুরী। শিল্পীর নিজের সংগৃহীত কয়েকশো পোস্টারের মধ্যে থেকে দুই ডজনকে বেছে তোলার কাজটি নিঃসন্দেহে দুরূহ। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কাইয়ুমের পোস্টারগুলিকে ভাগ করেছেন তিনটি ভাগে। সাংস্কৃতিক পোস্টার, সামাজিক পোস্টার ও রাজনৈতিক পোস্টার। সবদিক থেকে বিচার করলে এই শ্রেণীবিভাজনকে যথার্থ বলেই মনে হয়। আসলে একজীবনে এত বিচিত্রধরণের কাজ করেছেন কাইয়ুম - তা একসঙ্গে দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। কত সহজভাবে বিষয়কে মেলে ধরতে পারতেন তিনি। যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে যে পোস্টারটি তিনি আঁকেন সেটি একটি অনবদ্য শিল্পকর্মে পরিণত হয়। যে সময়কালে (১৯৯২) পোস্টারটি আঁকা তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রায়শই সন্ত্রাসবাদীদের হামলা হচ্ছিল। বোমা ও বন্দুকের আওয়াজে কেঁপে উঠছিল শিক্ষায়তনের পবিত্র আঙিনা। শিল্পী তাই এঁকেছিলেন এমন এক পোস্টার যা দেখে মনের মধ্যে জেগে ওঠে ভিন্ন এক প্রত্যয়। একটি দণ্ডায়মান রাইফেল, সেখান থেকে গুলির পরিবর্তে বিস্ফারিত হয়েছে একটি সজীব আলপনা। তাকে ঘিরে পাখিরা উড়ছে, চারিপাশে ছড়ানো ফুলের মোটিফ। মাথার ওপর লেখা ‘সন্ত্রাস নয় সংস্কৃতি’। এই তো একজন যথার্থ শিল্পীর কাজ। আতঙ্ক ও হত্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সুন্দরের নিশান ওড়ানো। কাইয়ুমের নিজের কথায় ‘একজন শিল্পীকে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হতেই হবে। তা না হলে তিনি দেশের নাড়িটির সন্ধান পাবেন না।’ তাঁর যে কোনো

পোস্টারেই এই দেশের নাড়ির স্পন্দন ফুটে উঠতো। যেমন পৌষমেলা ১৪০৫-এর জন্য করা পোস্টারটি যদি আমরা দেখি। সেখানে দোতারা হাতে বাউল-শিল্পী গান গাইছেন আর তার পশ্চাৎপটে বিরাট একটি নকশি-পিঠের মোটিফ। পৌষের মাসে বাঙালির বহু সাধের পিঠে-পার্বনকে তিনি সূর্যের প্রতীকে রূপান্তরিত করেছিলেন। দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস না থাকলে এভাবে শিল্পসৃষ্টি করা যায় না। নকশিকাঁথার প্রদর্শনী উপলক্ষে করা পোস্টারটিতেও দেখি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক দুর্ঘটনাকে নিয়ে করা পোস্টারে তিনি রেখেছেন তাঁর নিজস্ব ভাবনার ছাপ। ১৯৮৮-এর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় পীড়িত মানুষদের ত্রাণ সংগ্রহের জন্য কাইয়ুম এঁকেছিলেন বিবর্ণ ঘোলা হলুদ আর কালো রঙের সমাবেশে একটি মর্মস্পর্শী পোস্টার। ঘরের চালে আশ্রয় নেওয়া মানুষ, ভেসে যাওয়া গরু, জলমগ্ন গাছের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মা আর মেয়ে, মায়ের হাতে ভিক্ষাপাত্র। পোস্টারে উৎকীর্ণ শামসুর রাহমানের কবিতা, ব্যস্ আর কিছু নয়। এতেই দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়, বন্যাদুর্গতদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে আত্মা।

পোস্টারচিত্র নিয়ে এমন বই আগে কখনও দেখিনি। আসলে পোস্টার আমাদের চোখে তাৎক্ষণিক একটি বিষয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে উপেক্ষা আর অযত্নে দ্রুত হারিয়ে যায় তারা। যাঁরা পোস্টার আঁকেন তাঁরাও অনেক সময় যত্নবান হন না এগুলির সংরক্ষণ নিয়ে। ফলত যা হবার তাই হয়। সুখের কথা কাইয়ুম চৌধুরীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার পরিণামে সম্ভব হয়েছে এই বইটি। যার তাৎপর্য আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বে অপরিসীম। তবে আফশোস একটাই যে বইটি সাদাকালোয় ছাপা হওয়ায় কাইয়ুমের অসামান্য রঙের দ্যোতনা এখানে অধরাই রয়ে গেল।